অপ্রাপ্তবয়স্ক

মণিরত্ন মুখোপাধ্যায়

বাইরের দরজায় গডরেজের গা তালাগুলো দুচক্ষে দেখতে পারেননা হরিপদ বাবু। বোঝা যায়না দরজা খোলা আছে না বন্ধ আছে। যদি একবার চাবি সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছ, তা হলেই চিত্তির, ভাঙ্গো দরজা। রোজই একবার অফিস যাবার সময় আর একবার অফিস থেকে ফেরার সময় বেলটা বাজান হরিপদ। যতক্ষণ লিফটটা উঠে আসছে অপেক্ষা করেন যদি খোলে দরজাটা মিলন। আজ তিনদিন, নাকি চারদিন হল, দরজা খুলছে না মিলন। যাবার সময় বলে গেছে করোলবাগ যাচ্ছে বন্ধুর দিদির বাড়ী, দু এক দিন থাকতে পারে।

আসলে চিন্তাটা চারু একটু আধটু নয়, বেশি বেশিই করে থাকে। ছেলেটা বড় হলে কি হবে, সব কিছু বলে করাতে হয়। চুল বড় হলে বলতে হয় যা চুল কেটে আয়। জামা কাপড় ময়লা হলে কাচতে বলতে হয়, না হলে কেচে দিতে হয়। খেতে আসতে বলতে হয়-, নইলে ভুলে বসে থাকবে খাবার সময়। এত বড় ছেলে পঁচিশ বছর পার, এত পড়াশুনা করেছে, ছোটবেলা থেকে বিদেশে থেকেছে, তবু নিজেরটা নিজে করে নিতে পারেনা।

তার চেয়ে চারুর নিজের ছেলে লালটু অনেক বেশি উপযুক্ত। নার্ভের ডিফেক্ট থাকায় একটা পা দুর্বল, খুঁড়িয়ে চলে, সামান্য লাফিয়ে। তা না হলে ক্রাচ নিতে হয়। তবু লালটুকে অত চোখে চোখে রাখতে হয় না। মিলনের মত এতবড় ধাড়ি ছেলের জন্যে চারুর অনেক বেশি চিন্তা। প্রায়ই বলতে হয় তাকে - দেখতো লালটু, মিলন দাদা ঘুমিয়ে পড়ল কিনা? ডেকে নিয়ে আয় নইলে ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমার হয়েছে মহা জ্বালা।

মিলন নামটা কে রেখেছিল, মিলন কুমার কাঞ্জিলাল? এটা একটা নাম হল নাকি? তার চেয়ে লালটুর নামটা অনেক ভাল, সুনন্দ ঘোষ। আজকাল নামের মাঝখানে কেউ কুমার লাগায় নাকি? কুমার ছাড়া অন্য কিছু যেমন শঙ্কর, নাথ, ভূষণ ইত্যাদি লাগান চলতে পারে। যেমন হরিপদ ধেকে পদ তুলে দিলে বেখাপ্পা লাগবে। এসব নিয়ে মিলনের সঙ্গে চারুর আর লালটুর অনেক আলোচনা হয়েছে। মাসীর সব কথাতেই সায় দিয়েছে মিলন, শুধু তাই নয় ও যে কোন কাজের নয় সেটা স্বীকার করতে ওর বিন্দু মাত্র দ্বিধা ছিলনা কখনো।

খালি সুনন্দ নামটাই নয়, লালটুকে নিয়ে চারু আর হরিপদর প্রচ্ছন্ন গর্ব আছে। ট্যাগোর ইন্টারন্যাশন্যাল স্কুলের ক্লাস সেভেনের ফাস্ট বয়, লেখা পড়া, ছবি আঁকা, ডিবেট সবেতেই সে বেস্ট। কেবল পায়ের জন্য খেলাধূলাটা তেমন পারে না। সে আর কি করা যাবে।

আজ নিয়ে তিনদিন নাকি চারদিন হল মিলন গেছে করোলবাগ। অফিসে যাবার সময় হরিপদবাবু লিফটের বোতাম আগে টিপে তারপর ছাপ্পান্ন নম্বরের বেল বাজালেন। ডিং ডং আওয়াজ পেলেন বাইরে থেকে। গডরেজের তালাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লিফ্ট উঠে এল। নিঃশ্বাস ছেড়ে ঢুকে গেলেন তিনি, নামতে নামতে ভুলে গেলেন মিলনের কথা। চাকরি করতে যেতে হয় কনট প্লেসে, সারাটা দিন কাজে কর্মে কেটে যায়, মনেও পড়েনা মিলন কেন আসছেনা করোল বাগ থেকে। তবু যদি কখনও বা মনে পড়ল একবার খবর করা উচিত, নেবেন কি করে খবর সেটা হদিস করতে পারেন না। লালটু। অতএব অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় কি? এ এক মহা ঝঞ্ঝাটে পড়া গেছে। পরের ছেলের দায়িত্ব যেচে নেওয়া যে কি ঝকমারি এখন বোঝা যাচ্ছে।

ইস্ট অব কৈলাসের এই ফ্ল্যাটগুলো সবগুলোই আটতলা। প্রতিটি তলায় ছটি করে ফ্ল্যাট, সেল্ফ ফাইনান্স স্কিমে তৈরি হয়েছে। হরিপদবাবু পাঁচতলায় একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন, তিপ্পান্ন নম্বরে থাকেন। তিনিই এই তলায় একমাত্র বাঙালি। বাকি সবাই পাঞ্জাবি। এরই মধ্যে ছাপ্পান্ন নম্বর বিক্রি হয়ে গেল। শোনা গেছিল কেউ একজন এন আর আই কিনেছে বাইশ লাখ টাকায়। তারপর সেই ভদ্রলোক একদিন যেচে আলাপ করে গেলেন, নাম বললেন শচীন্দ্রনাথ কাঞ্জিলাল। বাঙালি, এবং বেশ আলাপী মানুষ। পয়সাওলা লোক, বহুদিন ধরে বিদেশে আছেন, ইংল্যাণ্ডে, পনের বছর হয়ে গেল। হরিপদ বাবু ভরসা পেয়েছিলেন মনে।

শুধু পাঁচতলা বলেই নয়, এই ফ্ল্যাটগুলোর মধ্যে বলতে গেলে হরিপদ বাবুরাই একমাত্র গরীব লোক। এন.টি.পি.সির অ্যাসিসটেন্ট ম্যানেজার, কত আর মাইনে। এক টা ছেলেকে ভাল ইস্কুলে পড়িয়ে কোন রকমে চলে যায়। ধার ধোর নেই। ভাল জায়গায় ভাল বাড়িতে উঠে এসে চারু খুব সন্তুষ্ট। কালকাজি অঞ্চলে যে সব বাড়ীতে ভাড়া ছিলেন, চিন্তা করতে পারেননা। গুরুদেবের অসীম কৃপা নাহলে এত সুখ হয় ?

ম্যানচেষ্টারে কাঞ্জিলাল বাবুরা থাকেন, স্বামী স্ত্রী দুজনেই কাজ করেন, একটি ছেলে, মস্কো থেকে কমপিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়েছে। মেয়ে এখনও আঠের বছরের হয়নি, ওঁদের সঙ্গে থাকে। ভদ্রলোক সারাজীবন ভূগোল নিয়ে পড়াশুনা করেছেন, এখন ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। স্ত্রী একটি হাসপাতালের ফাইন্যান্স ম্যানেজার। প্রচুর রোজগার, অথচ ওঁরা ভারতীয় নাগরিকত্ব ছাড়েননি।

ছেলে প্রাপ্তবয়স্ক হলে ওদেশের সরকার আইন অনুযায়ী তাকে থাকতে দিলনা। তখন বাধ্য হয়ে পড়াতে পাঠাতে হল, মস্কোর প্যাট্রিস লুমুম্বা ইউনিভার্সিটিতে। প্রথম ছ'মাস ও কে রুশ ভাষা শিখতে হয়েছিল। ওই একটা জিনিস ও জানে ভাল, গড় গড় করে রুশ ভাষায় কথা বলতে পারে। পাঁচ বছরের মাথায় মিলন এমন টেকনোলজি শিখে এল যা অন্য দেশে কোন কাজেই লাগলনা। মিলনের কোথাও চাকরি হলনা। ইওরোপের কোথাও না।

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে মনমরা হয়ে পড়ল। তারপর উপায় না দেখে বাবা মা দিল্লিতে একটা ফ্ল্যাট কিনে রেখে দিয়ে গেল। এর বেশি সে কি আর আশা করতে পারে বাবা মার কাছে। এত বড় ধাড়ি ছেলে, এবার যা হয় করুক নিজে নিজে। হরিপদ বাবুরা আছেন, পয়সা কড়ি যা লাগবে ওঁরা পাঠাবেন, ভয়ের কি আছে। এখান থেকে কেউ তাকে তাড়িয়ে দেবেনা। এটা ওর নিজের দেশ।

চারুর তত্ত্বাবধানে মিলনের দিন ভালই কাটছিল। মনমরা ভাবটা কমে এল। মাঝে মধ্যে একটা আধটা ইন্টারভিউ দিয়ে এল। ভাত রুটি চারুই রেঁধে খাওয়াচ্ছিল কটা মাস। তা সেই মিলন সেই যে কোথায় গেল করোলবাগ যাচ্ছি বলে, এখনও পাত্তা নেই।

-তুমি রোজ রোজ বেল বাজাও কেন বলোতো? মিলন বাড়ি থাকলে খেতে আসত না? ও নিশ্চয় ফেরেনি। এমন গাধা ছেলে, ফোন করে মাসীকে একটা খবর তো দেবে, সে বুদ্ধি নেই।

হরিপদবাবু সব জানেন, সব বোঝেন কিন্তু করার কিছু নেই। ওর বাবা মা কতকাল ধরে বিদেশে, কাজকর্ম কথাবলা সবেতেই অন্য দেশের ছাপ স্পষ্ট। এমন কি চিন্তাধারার মধ্যেও পশ্চিমি ভাবধারা এসে গেছে। শচীন বাবু ছেলের সম্বন্ধে শেষ কথা জানিয়ে গেছেন।

—যতটা পারবেন দেখবেন, এতবড় ছেলে এখনও নিজেরটা বুঝতে শিখলনা। বাবা মা পাড়াপড়শি আর কত দেখবে?

এসব কথা মিলনের সামনেই হয়েছিল। মিলন তখন মুখ নিচু করে শুনছিল তারই অক্ষমতার বিবরণ। চুড়ান্ত রায় বেরিয়ে আসার পর অপরাধী দণ্ডিতের মত মুখের চেহারা হয়েছিল তার। নিজে রান্না করতে পারেনা, নিজে জামাকাপড় কাচতে পারেনা, নিদেন পক্ষে একটা মেয়ে বন্ধু পর্যন্ত যোগাড় করে উঠতে পারেনি। এতদিন ধরে বিদেশে কাটিয়ে এল কি করে সেটা একটা রহস্য। তা সে যেমনই হোক মিলন যেমন সেটাই ভাল। চারুর কাছে এই রকম মিলনকেই বেশ ভালো লাগে। পারেনা তো পারেনা, তাতে কার কত অসুবিধেটা হল?

চারুর কাছে গচ্ছিত রেখে তার বাবা মা ইংল্যাণ্ড চলে যেতে পেরে খুব খুসি। সেখানে রম্ একা আছে। মেয়ের নাম রমলা, আঠার পূর্ণ হয়নি, এরই মধ্যে একটি তামিল ছেলের সঙ্গে গোয়িং স্টেডি। মাঝে মাঝেই রাত্রে বাড়ি থাকেনা। আঠের পূর্ণ হলেই বিয়ে। মেয়ের বুদ্ধির বড়াই করেন রমুর মা, তামিল ছেলেটা সিটিজেনশিপ পেয়ে গেছে। অতএব রমুর পক্ষে ও দেশে থেকে যাবার ব্যাপারটা পাকা হয়ে যাবে। একটা কাজও করে, সেই হিসেবে বাবা মার ওপর মোটে নির্ভরশীল নয়। রমু মেয়ে হয়ে যা পারল, ছেলে হয়েও মিলন তা পারলনা। ওকে নিয়ে খুব মুশকিল। এত লেখাপড়া শিখেও কোন কম্মের হল না।

চারুমাসী অবশ্য বলেছেন— মিলন আমার যেমন আছে তেমনি ভাল। ও খুব ভাল ছেলে, দেখিস লালটু, একদিন ও একটা ভাল চাকরি পাবে। তখন আমরা সুন্দর মতন একটা মেয়ে দেখে এর বিয়ে দোব। ছাপ্পান্ন নম্বরে বাচ্চা কাঁদবে আর রাতের বেলা মিলন ডাকতে আসবে — চল মাসী একবার, বাচ্চাটা চুপ করছেনা কিছুতেই।

বলে চারুর কি হাসি। মিলন ঝাল আচার চেটে চেটে খাচ্ছিল ভাতের সঙ্গে। আগে তো ভাতই খেতে পারত না। মন ভুলান কথাগুলো জানা হয়ে গেছে, তাই ইদানিং হাসি পায়না ওর। নিজের অপারগতার প্রমাণ আর তার চাইনা। তবু চারু বলে চলেছেন,

– লালটুর একটা ভাইপো চাই না ভাইঝি চাই বলো?

–ভাইঝি, ভাইঝি। ছেলেরা বড় হলেই বলবে আমাকে— এই ল্যাংড়া যা ভাগ্ হিঁয়াসে।

যেদিন ইলেকট্রিক না থাকে, লিফ্ট চলেনা, ইস্কুল থেকে ফিরে ভারি ব্যাগ টেনেটেনে পাঁচতলা পর্যন্ত উঠতে লালটুর খুব কষ্ট হয়। একেবারে হাঁফিয়ে ওঠে। মিলন বাড়ি থাকলে গেট থেকে ওকে সঙ্গে করে আনে। ব্যাগটা নিজেই বয়ে আনে। অবশ্য তার আগে চারুকে বলে দিতে হয়।

—যা তো মিলন, লালটুকে নিয়ে আয়, আজ আবার কারেন্ট নেই। লক্ষ্মী বাবা আমার।

গান্দা মত ইংরাজী বইটার ফাঁকে একটা কিছু গুঁজে রেখে মিলন উঠে পড়ে। চারু মাসির জন্যে মিলন সব কিছু করতে পারে। লালটুর জন্যেও পারে। এর সঙ্গেই যতো কথাবার্তা, ভাবসাব, গপ্পো সপ্পো।

কটা দিন ছেলেটাকে না দেখে লালটুর বেশি অসুবিধে, না তার মায়ের, বলা যায় না। রাতে খাবার সময় হরিপদ বলেই ফেললেন —কিরকম মানুষ তুমি, একটা ঠিকানাও নিয়ে রাখতে পার না। কোথায় যে গেল ছেলেটা, বল দেখি।

অন্য সময় হলে চারু সহ্য করতনা, জবাব দিত। আজ গম্ভীর হয়ে বইল। অনেক পরে একটা বুদ্ধি এল মাথায়। ডুপ্লিকেট চাবি তো আছেই তার কাছে। দরজা খুলে ডায়েরি অথবা টেলিফোনের ছোট বইটা খুঁজলে হয়। করোলবাগের ঠিকানা পাওয়া যেতে পারে। নিদেন পক্ষে টেলিফোন নম্বর একটা। অথবা অন্য যা নম্বর আছে সেসব জায়গায় ফোন করা যেতেপারে। হাত গুটিয়ে বসে থাকার চেয়ে তো করা উচিত। এতক্ষণ কেন যে বুদ্ধিটা মাথায় আসেনি কে জানে। তক্ষুনি যেতে চাইল চারু। হরিপদ বললেন।

—আগে খাওয়াটা শেষ করো। রাত সাড়ে দশটা বেজেছে, ফোন নম্বর বা ঠিকানা নিয়েও কিছু করা যাবেনা এখন। তার চেয়ে কাল রবিবার, সকালে আরও দু চারজনকে ডেকে নিয়ে সবার সামনে দরজা খোলা উচিত। ওরা বড়লোক সেটা ভোলা উচিত নয়। এক্ষুনি একটা কিছু পাওয়া যাচ্ছেনা বললেই হল, তখন বদনামের অন্ত থাকবেনা।

পার্সোন্যাল ডিপার্টমেন্টে কাজ করে হরিপদ অনেক পোক্ত হয়েছেন। সব সময় খারাপ দিকটা আগে চিন্তা করে নেন। চারুর অত ভাবনা চিন্তা নেই, চাবি তো রয়েছেই, বদনাম দিল তো দিল। ওরা বিশ্বাস করে দিয়ে গেছে। কেউ কিছু বললেই হল নাকি? কেউ কিছু বললে শুনবই বা কেন?

রাত্রিটা বড় অস্বস্তিতে কাটল। হরিপদ উদ্বিগ্ন হলেও সেটা প্রকাশ করলেন না। সেটা তাঁর স্বভাবের মধ্যে নেই। তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলা ধীরে সুস্থে চা টা খেয়ে তিন তলার চক্রবর্তী বাড়ী গেলেন। আরও এককাপ চা বিস্কুট সহযোগে সমস্ত ঘটনার আলোচনা করে নিলেন। এমন কি অভ্যাস মত চারুর বুদ্ধির তারিফও সামান্য করে ফেললেন। আরও আধ ঘন্টা পরে চক্রবর্তী, তাঁর স্ত্রী, বড়ছেলে এবং হরিপদর সামনে তালা খুললো চারু। চারুই সবচেয়ে আগে ঢুকল। তার জানা আছে কোথায় কি আছে।

সামনের ঘরটা ড্রইং রুম। এল শেপের ঘর, সামনের দিকটা সোফা, সেন্টার টেবিল দিয়ে সাজানো বসার জন্যে। ওদিকটায় খাবার টেবিল রাখার জায়গা। ডাইনিং টেবিল নেই, প্রয়োজন নেই তাই। রান্নার পাট নেই এই তিনরুমের ফ্ল্যাটে। একটা এয়ার কণ্ডিশনার লাগান আছে। চারপাশটা বন্ধ, পর্দাটানা। সোঁদা সোঁদা গন্ধ ছাড়ছে, আবছা অন্ধকার। চক্রবর্তীর স্ত্রী বললেন

—এটা কি বলুন তো?

ওদিকে চারু আর লালটু রান্নাঘরের পাশের বেডরুমটায় ঝুকেছে। এটাতেই শোয় মিলন। বিছানা বালিশ চাদর সব ছড়িয়ে আছে খাটের ওপর, তার ওপর খান দুই বই। একটা হ্যারল্ড রবিন্সের ঢাউস পেপারব্যাক, আর একটা কমপ্যুটার আর্কিটেকচারের। টেবিলের ওপর কিছু নেই একটা খালি জলের জায়গা ছাড়া। যেন খেতে আসছে এতটাই ফাঁকা ঘরটা। চারু আর একটা জানলা খুলল, রোদ ঢুকল জানলা দিয়ে। এই ঘরটাতে চারু অনেকবার ঢুকছে, আজ যেন অচেনা অচেনা লাগছে। মানুষের বসবাস না থাকলে ঘরবাড়ির চেহারা এমন পাল্টে যায়।

—মা, মিলন দাদার চটি দেখো খাটের তলায়।

খাটের তলায় অনেক পেছন থেকে চটিজোড়া টেনে আনল লালটু। যেন ও দুটোকে কেউ লাথি মেরে অনেক দূরে ঠেলে দিয়েছে। লক্ষণ ভাল লাগছে না, চারুর ভ্রু কুঁচকে গেল। অতদূর চটি ছুঁড়ে দেবে কেন মিলন, যেটাকে পরে বার করে আনতে কষ্ট হবে। তাছাড়া বাড়িতে পরার চটি না নিয়েই গেছে অতগুলো দিনের জন্যে? অবশ্য হাতে পয়সা আছে ওর, আর করোলবাগে হাওয়াই চটি পাওয়া যায়না এমন নয়। ওদিক থেকে হরিপদ বাবুর উত্তেজিত গলা শোনা গেল।

—চারু, শিগ্‌গীর এস এদিকে। তাড়াতাড়ি।

দৌড়ে এসে গেল চারু, তার পেছন পেছন লালটু কিছুটা লেংচে কিছুটা লাফিয়ে এল। ড্রইংরুমের পাখাটা তখন অন করে দেওয়া হয়েছে। ওদিকের বেডরুমের দরজার নিচ দিয়ে আঠাল কাল রঙের কিছু একটা জিনিস দেখা যায়। তাই হাতে করে একটু তুলে চক্রবর্তী বাবুর মনে হয়েছে পচা রক্ত। বেজায় দুর্গন্ধ, আঠাল জিনিস।

হরিপদর ভয় হয়ে গেল প্রচণ্ড, সত্যি যদি রক্ত হয় তো সেটা এল কোথা থেকে? দরজা তো বন্ধ, ভেতর থেকে বন্ধ। এমন যে লালটু সেও বুঝে নিয়েছে মিলন দাদা কিছু গোলমাল পাকিয়েছে বড় রকমের। বুদ্ধিমান মানুষ চক্রবর্তী বাবু সবাইকে ডেকে বাইরে নিয়ে এলেন। বাইরের দরজাটা টেনে বন্ধ করার আগে চারুর কাছে চাবিটা আছে কিনা দেখে নিলেন। এখন পুলিশকে খবর করা উচিত। তার আগে এই ফ্ল্যাটবাড়ির ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সেক্রেটারিকে খবর দেওয়া দরকার। কপালে ভোগান্তি আছে সবার অবধারিত।

হরিপদর বাড়িতে টেলিফোন নেই। চক্রবর্তী বাবুর বাড়িতে এসে বসল সবাই। এখন কারো মুখে কথা নেই, সবচেয়ে খারাপ অবস্থা হরিপদবাবুর। কাঁদো কাঁদো গলায় অতি কষ্টে সেক্রেটারিকে বলতে পারলেন ব্যাপারখানা। দেখতে দেখতেআরও পাঁচজন জড়ো হয়ে গেল। রবিবারের দিন, সবার ছুটি। তারপর সেক্রেটারি লুথরাসাহেব নিজে খবর দিল থানায়।

খুব বেশি দেরি করলনা থানার লোকেরা। এল একটা জীপ, একজন এসিসট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টরআর দুজন পুলিশ। তাদের আগেই বলা ছিল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ আছে, খোলা হয়নি। হয়তো ভাঙতে হতে পারে। এতক্ষণে ভিড় হয়েছে বেশ। কুড়ি পঁচিশ জন হবে সব মিলে। সবাইকে ভেতরে আসতে মানা করল পুলিশ, এমনকি চারুকেও।

ভাঙতে হলনা দরজা, বার দশেক লাথি আর কাঁধের ধাক্কাতে ছিটকিনি উপড়ে খুলে গেল। সিলিং ফ্যান থেকে মিলন ঝুলছে, গলায় সবুজ রঙের নতুন নাইলন দড়ি। মাথাটা বুকের কাছে লটকে আছে, পায়ের কাছে অনেকখানি দুর্গন্ধযুক্ত রস পড়ে গড়িয়ে গেছে দরজার তলার দিকে ড্রইংরুমের দিকে। পাজামা প্যন্ট জুতো মোজা পরা।

স্তম্ভিত অবস্থাটা কেটে যাবার পর পুলিশ সবাইকে বাইরে যেতে বলল। বাইরে এসেও কিন্তু কেউ নড়ল না। ছোট ছোট জটলা করে দাঁড়িয়ে রইল, খালি চারু একফাঁকে নিজের ঘরে এসে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ল। মিলনের এই ছিল মনে? একবার ঘুণাক্ষরেও চারুমাসীকে বললনা, জানতে দিলনা মনে কি ছিল তার। পরাজয়টা ভয়ানক লাগছিল মনে। নির্বান্ধব পরিবেশে চারু অনায়াসে মিলনের মা হয়ে গিয়েছিল। সে অধিকার তার কাছে এমনি এমনি এসে গিয়েছিল। তীব্র মনস্তাপ হতে লাগল যখন সেই উঁচু জায়গা থেকে হঠাৎ নেমে এসে দাঁড়াল সে।

অনেকটা কেঁদে নিয়ে চারু উঠল, মুখে চোখে জল দিয়ে। তারপর আবার ছাপ্পান্ন নম্বরে এসে হরিপদকে ধরল। কাঞ্জিলাল বাবুকে খবর দিতে হবে। যাঁদের ছেলে তাঁরা বুঝুন। টেলিফোন নম্বর লেখা ছোট্ট বইটা চারুর হাতে। নম্বরটা পুলিশেও লিখে নিল।

—এখন ওখানে রাত্রি, পরে ফোন করব।

—রাত্রি তো কি হয়েছে? যাদের একমাত্র ছেলে মরেছে তাদের আবার দিনরাত্রি কি?

বাইরের দরজার চাবি পুলিশে নিয়েছে, ফোটোগ্রাফার আসবে, ডাক্তার আসবে। আই বি, সি আই ডি, ডিপার্টমেন্ট, কি সব বলে চলেছে ওরা। সেসব চারুর কানে যাচ্ছিল না। এমবুলেন্স, ডোম, এই সব শব্দগুলো যেন অন্য জগতে ব্যবহার হয়ে থাকে। ওরা সবাই জল খেতে এল হরিপদর বাড়ি, কিন্তু চারু সেই যে দরজা বন্ধ করেছে আর বের হয়নি। আজ রান্না বান্না করতে পারবেনা ভেবে চক্রবর্তী গিন্নি দুটো বেশি করে হাত চড়ালেন। লালটু তো বাচ্চা, তার তো ক্ষিদে পাবে? সকালের জলখাবার হয়তো পেটে পড়েনি কারো। ছেলেটাকে কিছু খাইয়ে নিজের কাছে আটকে রাখলেন তিনি।

—আচ্ছা গাধা লড়কা, এক সুইসাইড নোট লিখ ছোড়না চাহিয়ে, ইতনা তক মালুম নেহি। অব সবকে লিয়ে পরেশানি খাড়া কর দিয়া।

পুলিশ অফিসারের মন্তব্যে সবার চমক ভাঙল। সত্যিতো, মিলন যদি একটা চিঠি লিখে যেত—আমার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয় তাহলে জিনিসটা সবার পক্ষেই সোজা হয়ে যেত। ওরা পরিষ্কার করে বলে গেল, পুলিশ এটাকে খুনের কেস বলে তদন্ত করবে। এবং যতদিন তদন্ত শেষ না হয় ততদিন যেন হরিপদরা দিল্লি ছেড়ে কোথাও না যায়।

দুটো বাজল মৃতদেহ নিয়ে যেতে। নানাভাবে জেরা করল ওরা হরিপদকে, চারুকে এবং লালটুকে। অন্য বাসিন্দারাও বাদ গেলনা। মিলন মরে গিয়েও ওদের বিপদে ফেলে দিয়ে গেল। রীতিমত পচা গন্ধ ছেড়েছে মিলনের শরীর থেকে। তার ওপর ময়না তদন্তের পর ওরা মর্গে রাখবে শরীরটা। নিজের বাবা মা না আসা পর্যন্ত মর্গে থাকবে মিলন, আরও পচবে। পচুক্‌গে, গলে যাক মিলনের দেহ, তাতে

চারুর কি?

এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি লুথরা নিজে উকিল। পুলিশের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিয়েছেন ছেলের বাবার সঙ্গে ম্যানচেষ্টারে। আগামিকালের মধ্যে ওঁরা এসে পড়বেন মনে হয়। টিকিট পেলেই ফ্লাইট নম্বরটা জানাবেন ফোনে। হরিপদ জিজ্ঞেস করলঃ

—আপ সুইসাইড কে বারে মে বোলা থা কাঞ্জিলাল বাবুকো?

—হাঁ জী, বোলা থা। সবকুছ বোলা হুঁ।

দাহ সংস্কার হবেনা ওঁরা না এলে। এছাড়া মিষ্টার এবং মিসেস ঘোষকে সন্দেহ করা হচ্ছে সেকথাও বলেছেন উনি কাঞ্জিলাল বাবুকে। হত্যা বা তার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত আছেন এমন কথাও বলেছে পুলিশ। তাদের আর দোষ কি। সন্দেহ করা ওদের পেশা। তবে বেশি হ্যানস্থা করতে দেয়নি লুথরা। এখন ওঁরা এসে পড়লে হয় তাড়াতাড়ি।—ইতনা ব্লাড কাঁহ যে আয়া, সমঝ মে নেহি আতা।

গলায় দড়ি দিলে পায়ের নিচে এত রক্ত আসবে কেন এটা কারো মাথায় আসছে না। এই নিয়ে ধন্দে পড়েছে পুলিশ, স্বাভাবিক ভাবেই। শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন নেই, কেবল পায়ের গোছের কাছে ফেটে গেছে লম্বা লম্বি ভাবে। দুটো পায়েই এমন দাগ রয়েছে। পোষ্ট মর্টেম হলে বোঝা যাবে। উপস্থিত খুন হয়েছে মনে করে তদন্ত চলবে।

দরজা ভেঙেই একরকম ঘরে ঢোকা হয়েছে সবার সামনে ঘরের মধ্যে আগে কেউ ঢোকেনি, চারপাশ বন্ধ ছিল, তাহলে খুন হবে কি করে? কারো মাথায় এই কথাটা ঢুকছেনা কেন?

মৃতদেহ নিয়ে চলে যাবার পর হরিপদ স্নান টান করে নিচের বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে এলেন, চারুর খাবার প্রশ্নই আসেনা, তার গলা দিয়ে আজ কিছু নামা অসম্ভব। ঘরে ঢুকেই হরিপদ শুনলেন

—ভাগ্যে তোমার কথা শুনেছিলাম। কাল রাতে আমরা ওদের ফ্ল্যাটে ঢুকলে কি সর্বনাশ হত বলতে পার? আচ্ছা তাঁদের ছেলে, আমাদের কেমন ঝুলিয়ে দিয়ে গেল দেখেছো?

—আমার কথা তুমি শুনতে চাওনা, এবার বোঝো। ফাঁড়া এখনও কাটেনি। দুধ কলা দিয়ে সাপ পোষা হয়েছিল। আজ পর্যন্ত কত টাকা তুমি ওর পেছনে খরচ করেছ বল দেখি? আহাম্মক ছেলে, সামান্য বুদ্ধিটাও নেই যে কিছু লিখে না গেলে অন্যদের বিপদ হতে পারে। কাল অফিস যাওয়া যাবেনা, মুস্কিল হল দেখছি।

রাত দুটোর সময় বেল বাজাল কেউ। এমনিতেই ওরা আতঙ্কিত ছিল, এখন বেশ ভয় পেল দুজনে। অপঘাত মৃত্যুর ছায়া তো আছেই, তার ওপর পুলিশের ঝামেলা। আলো জ্বালিয়ে সাবধানী হরিপদ জিজ্ঞেস করলেন

—কৌন হ্যায়।

—দরওয়াজা খোলিয়ে।

—নেহি খোলেঙ্গে, আপ হ্যায় কৌন?

—পুলিশ।

—পুলিশ রাত দো বাজে?

—দরওয়াজা খোলতে হেঁ কি নেহি?

ঠান্ডা মানুষ হরিপদ হঠাৎ কেমন রেগে গেলেন। চারুও পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ কি অন্যায় কথা? চিৎকার করে উঠল চারু

— নেহি খোলেঙ্গে, নেহি খোলেঙ্গে। যাইয়ে আপলোক, কাল সুবে আনা।

অন্য ফ্ল্যাটের কয়েকজন জেগে গেল চারুর তীক্ষ্ণ চিৎকারে। একে তো একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটেছে যার ছাপ রয়েছে সবার মনে, তার ওপর রাতের বেলা তিপ্পান্ন নম্বর থেকে মেয়ে গলায় চিৎকার। দৌড়ে এল অনেকে। কেউ নিশ্চয় লুথরাকে খবর দিয়েছিল, সেও ড্রেসিং গাউন জড়িয়ে এসে পড়ল।

প্লেন ড্রেসে তিন পুলিশ পড়ল মুস্কিলে। তাদের কাছে আইডেনটিটি কার্ড পর্যন্ত নেই। পুলিশের আবার আইডেনটিটি কি? আসরে নামল লুথরা স্বয়ং। বলল

—ম্যায় লুথরা হুঁ, এডভোকেট দিল্লী হাইকোর্ট। আপলোগোঁকা ইধর রুকনে পড়েগা, যবতক পুলিশ আ কর কাষ্টডি মে নেহি লেতা।

—দেখেঁ কোন রোকতা হ্যায় হমেঁ।

এসব হুমকিতে কাজ হলনা কোন, লোক জমেছে প্রচুর। পথ আটকাল সবাই মিলে। লুথরা চলে গেল ডিসিপি কে ফোন করতে। টাইমস্ অব ইন্ডিয়ার একজন সাংবাদিক গলা উঁচু করে বললেন, পরশুর কাগজে ছাপিয়ে দেবেন এমন জবর খবর।

একঘন্টা পরে একজন এসিপি এসে সনাক্ত করল তাদেব, ছাড়িয়ে নিয়ে গেল। যাবার আগে চুপি চুপি লুথরার কানে কানে বলে গেল, ওরা চাপ দিয়ে টাকা খাবার তালে ছিল। আপনারা বেশী কিছু করবেননা, তাহলে ওরা অন্য পথ নেবে। যা করার আমি করছি। যথেষ্ট হ্যানস্তা আর অপমান হয়েছে। ডায়েরিটা তিনি সুইসাইডে বদলে দেবার কথাও বলে গেলেন।

ব্যাপারটা তখনকার মত মিটলেও উকিল সবাইকে সজাগ করে বলল —মিস্টার আর মিসেস ঘোষ যেন উকিল ছাড়া কোন কথা না বলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে স্রেফ বলে দেবেন যা বলার উকিলের সামনে বলব। ব্যাস তাহলেই হবে, কেউ বিরক্ত করতে সাহস করবেনা। না ঘুমিয়ে রাত কেটে গেল, লালটু ইস্কুল গেলনা, হরিপদ গেলনা অফিস। কাঞ্জিলাল আসছে, আজ রাত বারটার সময় ঢুকবে। ততক্ষণ পালা করে পাঁচতলায় দল মিলে ঘোষেদের বাড়ি ডিউটি দিল মহিলারা। পুলিশের লোক যেন তুলে না নিয়ে যায় ওদের। তার জন্যে গেট বন্ধ রইল আর গেটে ডিউটি দিল রিটায়ার করা বুড়োরা। তেমন হলে জীপ ঘেরাও করবে তারা।

দুপুরের দিকে চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে দুটো ফোন করে এল হরিপদ, একটা অফিসে যেতে না পারার খবর দিয়ে, আর একটা ওঁর

এক বন্ধু সুজিত পাল কে হোম মিনিস্ট্রিতে। তিনি এখন ডেপুটি সেক্রেটারি। এদিককার খবর এবং পুলিশের ধাষ্টামোর কথা শুনে নিলেন মনোযোগ দিয়ে। পাল বাবু আগে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, সরস্বতী পুজো করতেন একসঙ্গে, লাইনে বসে সপরিবারে খিচুড়ি খেতেন। বহুদিন দেখা সাক্ষাৎ না হলেও কচিৎ কদাচিৎ ফোনে কথা বার্তা হয়ে থাকে। বলেছেন উনি—ভাববেন না ঘোষ বাবু, দুমিনিটে ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি, কোন থানা বলু নতো?

সারাদিনটা স্বস্তিতে কাটল। রাত্রি দুটোর সময় গেটের চৌকিদার হাজির করল কাঞ্জিলালদের নিয়ে ওঁদের বাড়ি।

মিসেস কাঞ্জিলাল ঢুকেই বললেন- ইণ্ডিয়ায় কাস্টমস্ এমন বিশ্রী, দেখুন দেখি, এগারটায় নেমেছি, বাড়ি ঢুকতে রাত দুটো বেজে গেল। কোন মানে হয়?

এনার পঁচিশ বছর বয়েসের ছেলে আত্মহত্যা করেছে কদিন আগে, এবং অন্তিম সংস্কার হয়নি এখনও। মৃতদেহটা ঠাণ্ডা ঘরে মর্গে কাঠের মত শক্ত হয়ে আছে, আর মা ঘরে ঢুকেই কাস্টমস সম্বন্ধে অভিযোগ করছেন। অমন মা না হলে অমন ছেলে হয়? লালটু ঘুম ভেঙে উঠে পড়েছিল, অবাক হয়ে শুনছিল ওদের কতাবার্তা।

—এই নাও লালটু তোমার জন্যে এই ক্যামেরাটা এনেছি। তুমি তো খুব বন্ধু মিলনের।

উনি কি জানেন না মিলন এখন ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে ট্রের উপর উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে এবং সেই ট্রেটা আছে ব্যাঙ্কের লকারের মত স্ট্রীলের আলমারীর খোপের ভেতর। তার পায়ের গোছে ফাটা দাগ ছাড়া আর কোন চিহ্ন নেই সন্দেহ করার মত। আছে আরও কিছু, যেমন ঘাড়ের মাংসের মধ্যে কেটে বসে যাওয়া দড়ির দাগ, আর দিনের পর দিন ঝুলে থাকার দরুন লম্বা হয়ে যায়া বকের মত গলা। পোস্টমর্টেমের রিপোর্টটা পুলিশরা পাঠিয়ে দিয়েছে, হয়তো সুজিত পাসের ধমকানিতে কাজ হয়েছে। তাতে লেখা আছে দড়ি দিয়ে ঝুলে মৃত্যুর কথা। একদিনের ভেতর সব কাজ শেষ করে ফেলেছে, রেকর্ড বলা যায়। শুধু তাই নয় অসুবিধে ঘটানর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে গেছে - কহা শুনা মাফ কর দেনা।

রিপোর্টে আরও বলেছে তিন দিনের মাথায় পায়ের টিসু পচে ফেটেছে শরীরের রসের আর পচা রক্তের চাপে, যা নাকি নেমে এসেছিল পায়ের দিকে। এটা খুব সাধারণ ব্যাপার, স্বাভাবিক ঘটনা।

—ওকি আপনাদের কিছুই বলেনি?

এতক্ষণ পরে মিষ্টার কাঞ্জিলাল মুখ খুললেন। হরিপদ চারুর দিকে আড়চোখে দেখে নিলেন একবার, বুঝলেন ফেটে পড়ার আগে চারু ফুঁসছে। থম থম করছে তার মুখ, লাল চোখ প্রচণ্ড রাগে জ্বলছে। নিজেই উত্তর দিলেন

—বলেছিল। বলেছিল করোলবাগ যাচ্ছি দু এক দিনের জন্যে। চার দিন যখন হয়ে গেল তখন আমরা ফোন নম্বর খুঁজতে ঘর খুলে ঢুকেছিলাম। পুলিশ তো আমাদের দুজনকে মার্ডারার সন্দেহ করে অনেক গণ্ডগোল করেছে। হাজতে ঢুকিয়ে দিত, কেবল সেক্রেটারী লুথরা উকিল হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে পারেনি।

—আশ্চর্য?

—সে অনেক কথা, পরে শুনবেন। সকালে মর্গ থেকে বডি নিয়ে দাহ করে আসতে হব।

—সে কি, আপনারা সেসব করেন নি?

—আমরা কে? আমাদের দেবে কেন বডি? তাছাড়া আমরাই তো সন্দেহভাজন লোক। হয়তো খুনই করেছি আপনার ছেলেকে।

—তাহলে তো খুব মুস্কিল হল। আমাদের যে আবার কালই ফেরার টিকিট রাত বারটায়। এয়ার ফ্ল্যান্সের ফ্লাইটে প্যারিস, সেখান থেকে ট্রেনে লন্ডন হয়ে ম্যানচেষ্টার।

ক্যামেরা রেখে দিয়ে লালটু ওদের কথা শুনছিল। মিলন দাদা মরে যেতে ওর বাবা মা কাঁদলনা দেখে অবাক হচ্ছিল। তার মাতো কেঁদে কেটে একসা হয়েছিল, অথচ মিলনদাদা ওদের কেউ নয়। মিলন দাদার বোনটা আসেনি কেন জানতে চাইছিল। তাহলে ওরা এসেছেই বা কেন যদি এত তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়? এসব প্রশ্ন ঝুলতে থাকল ওর মনে।

—লালটুর মত যদি মিলন ডিজেবল্ড হত তাহলে ও দেশে থাকতে পারত। তাহলে এমনটা হত না, আমাদের সঙ্গে থাকার নিষেধ থাকতনা। আর ফ্ল্যাটটা রেখে কি হবে? ওটা বিক্রি করে দোব, আপনাকে পাওয়ার অব এটর্ণি দিয়ে যাব। মিলনের জন্যেই বাড়িটা কেনা হয়েছিল। ওই যখন রইলনা—

শ্রীমতি কাঞ্জিলাল মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন — আপনাদের যা খরচ পত্র হয়েছে সব নিয়ে নেবেন কেমন, কোনরকম চক্ষুলজ্জা করবেন না।

আর সহ্য করতে পারলনা চারু। হাত জোড় করে বলল

—ছেলেটাকে দিয়ে গিয়েছিলেন আমার হাতে, তাকে জ্যান্ত ফেরত দিতে পারলাম না। আপনাদের কোন খরচ দিতে হবেনা, ওর জন্য আমাদের কোন খরচই হয়নি আজ পর্যন্ত। আর পাওয়ার অব এটর্ণি আপনারা লুথরাকে দিয়ে যান, উকিল মানুষ ওই পারবে ভাল দামে বাড়ীটা বিক্রি করে দিতে। আমরা নেহাৎ সাধারণ মানুষ, অত বেশী দায়িত্ব নেব কেমন করে বলুন?

সমস্তটা হিসেবের বাইরে হয়ে যাচ্ছিল তার। প্রচণ্ড অভিমান চোখ দিয়ে বর্ষার জলের মত নেমে আসছিল। কি রকম মা বাবা এরা? মিলন চলে গেছে, যেন ওরা বেঁচে গেছে। সে বেঁচে থেকে বড্ড অসুবিধের কারণ হচ্ছিল। পাখিরা তাদের বাচ্চাদের তাড়িয়ে দেয় ঘর থেকে যখন তারা বড় হয়ে যায়। চিনতেও পারেনা নিজের সন্তানদের। প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে ওরাও পাখির মত চিনতে পারছে না আর। নিঃশব্দে কাঁদতে লাগল চারু।